রবীন্দ্রনাথ ও ন্যায়বিচার

মীনাক্ষী সেন

'প্রবলের অত্যাচার'

রবীন্দ্রনাথ তার 'গান্ধারীর আবেদন' -কাব্যনাটকে যখন বললেন 'দণ্ডিতের সাথে/দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/ সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার' —তখন এর অর্থ বোঝা সহজ হয়। পিতা যখন পুত্রকে দণ্ড দেন, তখন তার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই নিশ্চয়ই। সে বিচার তো নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব শ্রেষ্ঠ। সমদর্শী ও নিরপেক্ষ বিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পিতা পুত্রের প্রসঙ্গ আরও এনেছেন। যেমন তাঁর রতনরাও রাজার কবিতায়। যেখানে 'বিপ্র কহে, রমনী মোর আছিল যেই ঘরে/নিশীথে সেথা পশিল চোর ধর্মনাশ-তরে/বেঁধেছি তারে, এখন কহো চোরে কী দিব সাজা।' /'মৃত্যু' শুধু কহিলা তারে রতনরাও রাজা।'

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে জানালেন 'চোর সে যুবরাজ-বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে/, কাটিল প্রাতে আজ/ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে, কি তারে দিব সাজা?/ মুক্তি দাও কহিলা শুধু রতনরাও রাজা' এখানে রতনরাও রাজার ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উচ্চ ন্যায়বিচার আদর্শকেই রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন। এসব বোঝা যায়, কিন্তু বেশ ধন্দ লেগে যায়, এরপর যখন, গান্ধারীর আবেদনে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'যার তরে প্রাণ/ কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান/ প্রবলের অত্যাচার।' বিশেষত এই সময়ে, চারিদিকে যখন হামদো, মামদো, জামদো অপরাধীদের আরও কত যে অপরাধ। এসব অপরাধ যারা করে— তারা যদি একবার ক্ষমতাশালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলে অথবা ক্ষমতাশালীদেরই কেউ হয়, অথবা হয় আর্থিক বা সামাজিকভাবে শক্তিশালী, তবে তারা ধরে পড়ে না, ধরা পড়লেও ছাড়া পেয়ে যায়, শাস্তি পায় হাতে গোনা ক্ষেত্রে।

বহু লোকের সামনে এক তরুণীকে অগ্নেয়াস্ত্র বের করে খুন করলে এক মন্ত্রীপুত্র। অথচ সাক্ষ্যপ্রমাণ অভাবে ও দুর্বলভাবে কেস সাজানোর কারণে ছাড়া পেয়ে গেল খুনি। পরে অবশ্য উচ্চ-আদালতে তার শাস্তি হল কিন্তু খুনের শাস্তির দাবিতে কত না ক্ষোভ - বিক্ষোভ, মিটিং - মিছিল করতে হল। এত সবের পর খুনি মন্ত্রীপুত্রের যখন শাস্তি হল তখন তো সবার খুশি হবার কথা। ব্যথা পাবার প্রশ্ন আছে কি?

এ ঘটনা কোনও এক মহানগরীর বলে সারা দেশে প্রচার পেয়েছে, কিন্তু দেশের নানা প্রান্তেই এমন ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। কত যে এমন উদাহরণ সবার চোখের সামনে। লোকের মুখে, সংবাদপত্রের পাতায় এইসব ঘাঘু দুর্বৃত্ত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জোরে যারা দাগি অপরাধী হয়েও শাস্তি পায় না, তারা শাস্তি পেলে কি তাদের জন্য ব্যথা পাবে দণ্ডদাতা? না তাদের শাস্তি দিয়ে খুশি হবে? স্বস্তি পাবে? এমন শাস্তি কেন প্রবলের অত্যাচার?

'গান্ধারীর আবেদন' —আরও পড়লে, এর জবাব রবীন্দ্রনাথই দিয়ে দেন। বোঝা যায় এক অসাধারণ কবি কি সহজ নৈপুণ্যে ন্যায়বিচারের মূল ভিত্তি কী হওয়া উচিত, তা দুটি লাইনের মধ্যে বলে দিলেন।

আসলে রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী যাকে ন্যায়বিচারের পাঠ দিচ্ছিলেন তিনি তো কোনও ব্যক্তি নন— তিনি হচ্ছেন 'রাজা, রাজ অধিরাজ' 'ধর্মরক্ষা কাজ' যার ওপর সমর্পিত। অর্থাৎ গান্ধারী একথা বলছিলেন রাষ্ট্রের প্রতিভূ রাজাকে। এই রাষ্ট্র তো তার অধীনে যাদের রেখেছে তাদের সকলেরই অভিভাবক। শ্রীমা সারদার ভাষায় বলা যায় সে সৎ-এরও মা, অসৎ-এরও মা।

অপরাধ করলে সন্তানকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু সেই শাস্তি দেওয়ার মধ্যেও অভিভাবকের মঙ্গলকামনাই তো নিহিত থাকে। সন্তানকে শাস্তি দিয়ে খুশি হ'ন কোন মা-বাবা? বরং 'শতগুণ বেদনা' তাদের বুকে বাজে— তবু ন্যায়ের খাতিরে, সন্তানকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার খাতিরে মা-বাবা তাকে শাস্তি দেন। সন্তানের ভুল সংশোধনের পথও তো শাস্তির মধ্যেই নিহিত।

কিন্তু যে শাস্তি কেবল ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য, যে দণ্ডদানে দণ্ডদাতার বুকে ব্যথা বাজে না, যে শাস্তির ভেতর অভিভাবকের মঙ্গলকামনা নেই—সেই শাস্তিতে কারো মঙ্গল হয় না। এ ধরনের শক্তি প্রদর্শন, ব্যথাহীন দণ্ডদান পাপীকে শাস্তি দিতে গিয়ে পাপকেই ডেকে আনে—একথা রবীন্দ্রনাথ যে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রকেই বললেন তা আরও স্পষ্ট হয় এরপর যখন গান্ধারী বলেন—শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার/ সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার/নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে/ নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে;/নতুবা বিচারের তার নাই অধিকার'—

হ্যাঁ, ব্যথাহীন বিচারকে বিশ্ববিধাতার পক্ষেও অনধিকারচর্চা বললেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীর আবেদন লিখেছিলেন ১৩০৫ সালে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কয়েক বছর আগে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের বা ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের কয়েক বছর পর। এই সময়ই 'কোম্পানীর আমল' গিয়ে ভারতের বুকে জাঁকিয়ে বসছে 'মহারানীর শাসন'। তৈরি হচ্ছে ব্রিটিশ প্রণীত ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি, দেওয়ানি আইন, সরকারি আইনকানুন, রীতি-নিয়ম। সুসংগঠিত ভারতীয় পুলিশ, আইন আদালত, সৈন্যসামন্তসহ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

এ সময় ভারতবর্ষের উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী ইংরেজের গুণমুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্রিটিশ ইংল্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা তারা ১৮৫৯ সালে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে ব্রিটিশ

অনুগত প্রজা হিসেবে এবং 'তাদের স্বার্থকে গদিনশিন শক্তির সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে।' (রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় চোরাটানের ইতিহাস-তৈমুর রেজা, ৩৭১ পৃষ্ঠা অনুষ্টুপ শীত সংখ্যা ১৪১৮) অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের ভাবভঙ্গি হল তারাই ভারতীয়দের জন্য সভ্যতা এনেছে। 'এক সভ্য, আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা তারা ভারতীয়দের উপহার দিয়েছে (সভ্যতার সংকট, কবির ছবিটিতে, উদয়নারায়ণ সিংহ, অনুষ্টুপ, ১৪১৮, পৃ. ১২২)। কোম্পানি আমলের যা একটু আধটু বিশৃঙ্খলা বা অন্যায় তার অবসান হয়েছে মহারানীর সুশাসনে। কিন্তু আসলে তারা কী করেছিল ভারতবর্ষে 'মহারানীর শাসন' চালু করে, সেকথা জীবনসায়াহ্নে এসে রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি লিখলেন তাঁর 'সভ্যতার সংকট' -এ—'সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা - কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি;...'

এই সভ্যতার সংকটেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কি অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।'

এসব রবীন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্নের কথা। কিন্তু মধ্য-তিরিশে, রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন শতধারায় উচ্ছ্বসিত, সেই সময়ে তীক্ষ্ণধী রবীন্দ্রনাথ মহারানীর শাসনে, তার ন্যায়বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি করতে পারছিলেন না— এমন তো হতে পারে না। ওই ব্রিটিশ প্রণীত 'দণ্ড' বা বিধি এবং ব্যবস্থা, যাকে রবীন্দ্রনাথ 'বাইরের জিনিষ' —বলেছেন, রাজনীতির ভাষায় বললে বলা যায় তা হল ইংরেজের আমদানি করা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক বলেই তা স্বভাবতই দ্বিচারি। এ ব্যবস্থা একদিকে সাদা ও বাদামি চামড়ার মধ্যে তফাত করে, তেমনই ফারাক করে রাজপুরুষ ও সাধারণ মানুষে-এটা দেশের ভেতরের কথা। আর যদি ইংরেজের নিজের দেশের কথা বলা যায়, তাহলেও এটা সত্যি যে তাদের নিজেদের দেশে যে 'দণ্ড' বা 'বিধি-ব্যবস্থা' তা নিশ্চিতই ভারতে তারা যা চালু করেছিল, তা থেকে আলাদা।

কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের মুখে শুনেছি ইংল্যান্ডে নাকি পুলিশকে মানুষ 'বুবি' বা বন্ধু বলে ডাকে। মানুষকে বিপদে-আপদে-প্রয়োজনে সাহায্য করা তাদের একটি অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে তারা জানে।

ব্রিটিশ আমলে পুলিশকে বন্ধু ভাবা তো দূরের কথা সিপাই-এর উর্দির আভাসমাত্র দেখলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হত তা ফকিরমোহন সেনাপতি থেকে শুরু করে আরও কত কথাসাহিত্যিক যে লিখে গেছেন—এমনকী আজও, স্বাধীন ভারতে যে ব্রিটিশ ব্যবস্থার উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি সেই পুলিশি-ব্যবস্থায় কি মানুষ পুলিশকে বন্ধু ভাবতে পেরেছে না পুলিশ ভাবতে পেরেছে জনসেবা তার অন্যতম প্রধান কাজ?

কাজেই এই যে ব্রিটিশ প্রণীত দ্বি-চারি ব্যবস্থা তার দিকে তাকিয়েই কি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—যে দণ্ডবেদনা/ পুত্রেরে পার না দিতে/সে কারে দিও না;/যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে, মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে।

জানি না রবীন্দ্রনাথ কেবল চরিত্র ও কাহিনি চিত্রণের প্রয়োজনে এই কথাগুলো গান্ধারীকে দিয়ে বলালেন না মহারানী শাসন কায়েম হয়ে বসা ও স্বদেশ চেতনার 'অরুনোদয় কালে'—এ ছিল ব্রিটিশ শাসকের দ্বিচারিতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার? আসলে লেখক তো লেখেন, পাঠের প্রতিক্রিয়া তো পাঠকের। আমি তাই পাঠক হিসেবে 'গান্ধারীর আবেদন' যত বার পড়ি, তত বার মনে হয় এ যেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র শাসকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী। ন্যায়বিচারের মূল ভিত্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে ব্যথাহীন বিচার ও দণ্ডদান থেকে প্রবল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে বিরত থাকার আহ্বান।

এই যে ব্রিটিশ দ্বি-চারি ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে ত্রিশের দশকে খোলাখুলি কলম ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। আন্দামানের সেলুলার জেল সভ্য বলে কথিত ব্রিটিশ শাসকের বর্বরতার ছিল জ্বলন্ত উদাহরণ। সেখানে ব্যারী-সাহেবের শাসনে যখন 'তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে' 'পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে মরছিল'—প্রতিবাদের অন্য উপায় না পেয়ে আত্মহত্যা করে প্রতিবাদ করছিল বালক ফণীভূষণ—অনশনে প্রাণ দিচ্ছিল কত না নিবেদিতপ্রাণ তরুণ—সেই সময়— 'আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দিরা দাবী করিয়াছেন তাহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ আগস্ট, ১৯৩৭)। সেই দাবির স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ আঙুল তুলেছেন ব্রিটিশ দ্বিচারিতার প্রতি। বলেছেন '...ইংল্যান্ডে বন্দিদিগকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে ঐরূপ কোনো কুখ্যাত স্থানে প্রেরণ করিয়া তাহাদের দুঃখভার বৃদ্ধি করে না। তাহাদিগকে শুধু পরাধীন জাতির ক্ষেত্রে তাহাদের নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়া আমরা যখন আতঙ্কিত হই তখন এই বৈষম্যে আমাদের সকলের হৃদয় অপমানেও আহত হয়। আমার দেশের নামে আমি ইহারই প্রতিবাদ করিতেছি।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ আগস্ট, ১৯৩৭; কুখ্যাত স্থান— লিপারী দ্বীপ, ডেভিল দ্বীপ-এর বন্দিনিবাস)।

১৯৩৭ সালের ২ আগস্ট টাউন হলের বিক্ষোভসভায় ওই দাবির সমর্থনে বক্তৃতা করার সময় রবীন্দ্রনাথ বলেন 'এই গভর্নমেন্ট জন-সাধারণের নিকট দায়ী নহেন, সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে সহস্র মাইল দূরবর্তী এক দ্বীপে নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দিদের সহিত যে ব্যবহার করা হয়; সেই সম্পর্কে দেশবাসীর মনে স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে...'

এই যে গভর্নমেন্ট, ১৯৩৭ সালে যখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তারা 'জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন' তারা কেবল নিজদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই ব্যবহার করেছিল তাদের তৈরি 'দণ্ড' বা 'বিধি-ব্যবস্থা' বা 'Law and order' বজায় রাখার ব্যবস্থা বা দারোয়ানিকে। যে দারোয়ান ভারতীয় চোরকে হয়তো আটকাচ্ছিল, কিন্তু ইংরেজ খুনি বা তস্করদের জন্য খুলে দিচ্ছিল দরজা— সেই ব্যবস্থার প্রবেশপথে যে পুলিশ ব্যবস্থা, সে সম্পর্কে কি বললেন রবীন্দ্রনাথ? ১৩৩৮-এ, 'গান্ধারীর আবেদন' লেখার তেত্রিশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন '...পুলিশ একবার যে চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনওকালে ফুল ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। ...পুলিশের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শও সাংঘাতিক। ...উহাদের নিঃশ্বাস লাগিলেই কাঁচাপ্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে।'

৪ মে, ১৯৩০ সালে শোলাপুরে জনসাধারণের ওপর পুলিশের গুলিচালনা প্রসঙ্গে লিখলেন—এই ধরনের ক্রিয়াকলাপে বড়ো বড়ো কথা সাজিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, যেমন কিনা 'আইন-শৃঙ্খলা' ইত্যাদি। আর এসব তারাই করে যারা নিজেরাই যার থেকে বড়ো আর কিছু হতে পারে না সেই মানবতা আইনের সব চাইতে জঘন্য ধ্বংসকারী (ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, মে ১৬, ১৯৯০, ইংরেজি বিবৃতির বঙ্গানুবাদ—সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়)।

তারপর? ১৯৩০ গেল, ১৯৩৭ -এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হল। ব্রিটিশ বিদায় ঘটলো। তারও পরে ১৯৫০ -এ চালু হল ভারতীয় সংবিধান। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ভারতের রাজনৈতিক নেতারা নতুন করে লিখলেন কিন্তু ওই যে 'দণ্ড', 'বিধি ও ব্যবস্থা', যাকে রবীন্দ্রনাথ বললেন 'বাইরের জিনিষ'— তার কি হল? এই যে ব্রিটিশ প্রণীত পুলিশি ব্যবস্থা, যে 'পুলিশের নিঃশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণে অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে' যাদের 'লালায় করতে গিয়ে 'মানবতা আইনের সব চাইতে জঘন্য ধ্বংসকারী' তাদের কি হল? ব্রিটিশ প্রণীত ভারতীয় দণ্ডবিধি ইত্যাদির কি হল? ব্রিটিশ শাসকের মতোই ব্রিটিশ প্রণীত 'বাইরের জিনিস'কে আমরা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারলাম না। ব্রিটিশ গেল কিন্তু এরা গেল না। আমাদের রাজপুরুষেরা স্বাধীন ভারতের সংবিধান তনুন করে লিখলেন কিন্তু উদার-মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এই সংবিধানের অত্যন্ত প্রগতিশীল যেসব ধারা, উপধারা তার বাস্তব প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন আইন-কানুন, নতুন বিধিব্যবস্থা তৈরি হল না ব্রিটিশ প্রণীত ব্যবস্থাকে আমূল উৎপাটিত করে।

ফলে ঘাটে ঘাটে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল এই ব্যবস্থার দমনমূলক ও জন-বিরোধী গলদগুলো। ব্রিটিশ শাসকদের জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দেবার দায় ছিল না। স্বাধীন ভারতে পাঁচ বছর বাদে যে সরকার নির্বাচিত হয়, এই দায় সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই মাঝে মাঝে নতুন কোনও আইন, কোনও সংশোধন, কোনও পরিমার্জন হয়নি, এমন নয় কিন্তু মূলত এই ব্যবস্থা রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক শাসক রচিত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায়। এ যে কত সত্যি তা স্পষ্ট দেখা গেল ২০০৯ থেকে সারা ভারতে নানাভাবে জমি অধিগ্রহণ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বহুজাতিক ও ধনপতিদের শিল্পস্থাপনের মহান জনস্বার্থে, কৃষক বা প্রান্তিক মানুষদের জমি যখন নির্বিচারে অধিগ্রহণ চলছে ১৮৯৪ সালে 'মহারানীর রাজত্বে' ব্রিটিশ প্রণীত জমি অধিগ্রহণ আইনের সাহায্যে—একশো দশ বছরের মধ্যে স্বা?ীন ভারতের রাজপুরুষরা এই আইনটি বদলে নতুন আইন প্রণয়ণ করাকে 'জনস্বার্থ' ভাবেননি।

আমাদের পুলিশি ব্যবস্থাও একইরকমভাবে রয়ে গেছে মূলত ব্রিটিশ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায়। কেবল 'গ্রেপ্তার' সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের পুলিশ যে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে, যাতে বারবার মানুষের মৌলিক অধিকারে আঘাত আসে তাই নয়—পুলিশি দুর্নীতির উৎসও হয়ে ওঠে যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা, সেই ক্ষমতা ইংল্যান্ডের পুলিশের নেই। যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করে আদালতের আদেশ ছাড়া তারা কারো চুলও ছুঁতে পারে না— তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যতই উঠুক। 'আমাদের উচ্চতম ন্যায়ালয় বারবার পুলিশকে বিরত থাকতে বলেছে যথেষ্ট গ্রেপ্তার করা অভ্যাস থেকে। তাতে তেমন ফল দেখা যায়নি আজও। কারণ ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মতোই আমাদের রাজপুরুষেরাও, যখন ক্ষমতায় থাকেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা প্রয়োগের সুবিধা নেন। পুলিশি ব্যবস্থা পায় দুর্নীতি করার সুবিধা। সাধারণ মানুষের 'বন্ধু' হওয়া তো দূরের কথা, স্বাধীন দেশের পুলিশ আজও জনসেবা ও সাহায্য যে তার অন্যতম প্রধান কাজ তা মনে করে না। দুর্ঘটনাগ্রস্তকে সাহায্যের আবেদন করলে তারা 'ওটা আমার এলাকায় নয়' বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, যদিও যাদবপুরের একজন মানুষ বেলঘরিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে অনায়াসে এগিয়ে যান। আমাদের স্বাধীন ভারতের 'পুলিশের লালায়' যে কত বিষ তা যারা এক একটি রাজনৈতিক আন্দোলনকালে বন্দি হয়েছেন তা বিস্তর জানেন। দুর্বল, দরিদ্র বা অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ দুভাগ্যক্রমে যারা এদের হাতে পড়েছেন, তাদের কথা আর না-ই বললাম। অন্যদিকে এই দমনমূলক কঠোর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিধিব্যবস্থা, এই বিচারব্যবস্থায় অপরাধ কমে যাচ্ছে এমনও তো নয়। ন্যাশনাল ক্রাইম

রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সব ধরনের ঘৃণ্য অপরাধগুলো। অপরাধীরা ধরা পড়ছে কম, শাস্তি পাচ্ছে আরও কম। এসব দেখে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান্ধারীর আবেদন কে আবারও মনে পড়ে যায়— তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার হবে না, সেখানে ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে—ন্যায়ের নির্মমতারূপে/ পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে—

আজকে পুলিশি ও ন্যায় বিচারব্যবস্থার নীচে এত অন্ধকার জমতে দেখে তাই রবীন্দ্রনাথকেই বারবার মনে পড়ে। কত-কত বছর আগে তিনি রাষ্ট্রকে কোমলপ্রাণ অভিভাবক হয়ে ন্যায়দণ্ড হাতে নিতে বলেছিলেন, বলেছিলেন নিজ পুত্র ও অপরের পুত্রের বিচারে ভেদাভেদ না করতে। এই দ্বিচারিতা পাপ হয়ে ন্যায়বিচার ব্যবস্থাকেই কলুষিত করবে বলেছিলেন, বলেছিলেন ব্যথাহীন বিচারের নির্মমতা না করতে, তা কেবল প্রবলের অত্যাচার হবে, ন্যায়বিচার হবে না।

১৯৪১ -এ রবীন্দ্রনাথ মারা যান। এরও পরে ফ্যাসিস্ট বিভীষিকা ও আমেরিকার পরমাণবিক হিংসাকাতর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ক্ষতে প্রলেপ দিতে তৈরি হল রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৯৪৮-এ গৃহীত হল বিশ্বমানবাধিকার সনদ, যাতে সই করলো ভারতও। এরও পরে রচিত হল ভারতীয় সংবিধান, যার ধারা-উপধারায় এই সনদের ছায়া। অথচ 'মানবতা আইনের জঘন্য ধ্বংসকারী' যে ব্যবস্থাকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ -এই, যে ব্যবস্থার সমূল উৎপাটন হল না স্বাধীন ভারতে। ব্রিটিশ প্রণীত দণ্ডবিধি, সরকারি রীতি নিয়ম দিয়ে একটি স্বাধীন দেশের প্রগতিশীল সংবিধানের রূপায়ণ করার ব্যবস্থা চালু হল। 'বাইরের ব্যবস্থা' -কে বাইরে রেখে নতুন ব্যবস্থা তৈরি করে নতুন যাত্রা শুরু করতে পারলাম না আমরা।

তার ফল যা ফলার তা ফলেছে। এই ব্যবস্থার গলদ শুধরোতে বারবার নানা কমিশন তৈরি করে নতুন কমিশন তৈরি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে সুপারিশগুচ্ছ। পুলিশের কমিশন। এই ব্যবস্থায় শুরু থেকেই ব্রিটিশ দ্বিমুখী নীতির প্রভাবে ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতাশালী-ক্ষমতাহীনের যে তফাত ছিল তা দূর করতে লিগাল এইড সার্ভিস, পারিবারিক আদালত আরও নানা ব্যবস্থা ও আমাদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তা, একেবারে দূর হয়েছে, এই ব্যবস্থার অতি বড়ো প্রশংসাকারীও বলবেন না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সঙ্গীত করার মধ্য দিয়েই আমাদের রাজপুরুষদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন শেষ হয়েছে। আজও তাই বন্ধ হয়নি প্রবলের অত্যাচার। আসলে মনে মনে আমরা সবাই তো তাত্ত্বিক আলোচনা, দিক নির্দেশক আধুনিক প্রগতিশীল ব্যবস্থা সব কিছুর জন্যই বিদেশি তাত্ত্বিকদের ওপর নির্ভরশীল। কবি, তা তিনি যত বড়ো কবি-ই হোন না কেন তার কবিতা থেকে ন্যায়-বিচারের ভিত্তি খুঁজে নেব, এত বড়ো দুর্দিন আমাদের দেশের তাত্ত্বিকদেরও আসেনি, রাজপুরুষদের যে আসবে না, সে তো জানাশোনা কথা।